শনিবার, ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪
বর্ষ : ১২, সংখ্যা : ৩৫৫

ভোটের শেষ পর্ব শেষ হল গুজরাতে, বুথ ফেরৎ সমীক্ষায় এগিয়ে বিজেপি ই

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর গড় গুজরাতে বিধানসভায় ভোট মোটামুটি নির্বিঘ্নে শেষ হল বৃহস্পতিবার ১৪ ডিসেম্বর। হিমাচল প্রদেশ বিধানসভার নির্বাচন অনেক আগেই শেষ হয়েছে। নির্বাচন কমিশন ফল ঘোষণা করবে আগামী ১৮ ডিসেম্বর। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিভিন্ন টিভি চ্যানেল বুথ ফেরত সমীক্ষায় এগিয়ে রেখেছে বিজেপিকে। বেশ পিছিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। দুই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে এই দুই দলই ছিল একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রায় মাসাধিক কাল চলেছে নির্বাচনী প্রচার। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের মূল হাতিয়ার ছিল 'গুজরাত মডেল' ও উন্নয়ন। অন্যদিকে কংগ্রেস সভাপতি (ইলেক্ট) রাহুল গান্ধি নোট বাতিল, জিএসটিকে হাতিয়ার করে কামান দেগেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং বিজেপির বিরুদ্ধে। প্রচারে জাত, পাত, ব্রাহ্মণ, দলিত, সংখ্যালঘু সব বিষয় উঠে এসেছে মিছিলে, মিটিংয়ে, সমাবেশে। লড়াইয়ে মূল বিষয় ছিল উন্নয়ন বনাম পরিবারতন্ত্র।

এখন বুথ ফেরৎ সমীক্ষায় যে চিত্র উঠে এসেছে তাতে বোঝা যায়, বিজেপি এগিয়ে। শুধু তাই নয়, গুজরাতের ভোট আগামিদিনের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি স্থির করে দেবে বলেই ধারণা রাজনীতিকদের। গুজরাতের ভোটের দিকে এবার নজর ছিল সব দলের। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মোদী দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তা এক দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—"বুঝেছি, এতে ছায়া পড়বে।"

নরেন্দ্র গান গাইলেন, ঠাকুরের অসুখ বলিয়া বেশী গান হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ভগবান্ রুদ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে সেবা করিয়া নিজের আসনে বসিয়া আছেন। ডাক্তার ভগবান্ রুদ্র ও মাষ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে রাখাল লাটুপ্রভৃতি ঘনিষ্ঠ ভক্তেরাও আছেন।

আজ বুধবার, নন্দোৎসব, ১৮ ই ভাদ্র; শ্রাবণ অষ্টমী নবমী তিথি; ২ রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ।

ঠাকুরের অসুখের বিষয় সমস্ত ডাক্তার শুনিলেন। ঠাকুর নীচে মেজেতে আসিয়া ডাক্তারের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দ্যাখো গা, ঔষধ সহ্য হয় না! ধাতু আলাদা।

টাকা স্পর্শন, গিরোবান্ধা, সন্ধ্যা—এ সব ঠাকুরের অসম্ভব

"আচ্ছা, এটা তোমার কি মনে হয়? টাকা ছুঁলে হাত এঁকে বেঁকে যায়। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়!

তিনিই কর্তা! 'আমি' যতক্ষণ রেখেছেন, তাঁর আদেশ শুনে কাজ করবো।"

ঠাকুরের গলার অসুখ এইবার ডাক্তার দেখিবেন। ঠাকুর বলিতেছেন—"মহেন্দ্র সরকার জিহ্বা টিপেছিল, যেমন গরুর জিহ্বাকে টিপে।"

ঠাকুর আবার বালকের ন্যায় ডাক্তারের জামায় বারংবার হাত দিয়ে বলিতেছেন,—"বাবু! বাবু! তুমি এইটে ভাল করে দাও!"

Laryngoscope দেখিয়া ঠাকুর

দিনপঞ্জিকা

২৯ অগ্রহায়ণ, ভাং ২৫ অগ্রহায়ণ, **১৬ ডিসেম্বর**, ২৯ অঘোন, সংবৎ ১৩ পৌষ বদি,২৬ রবি আউঃ। সূর্য্যোদয় ঘ ৬।১৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৪।৫১। **শনিবার**, ত্রয়োদশী দিবা ঘ ৭।৩৭ মিঃ। অনুরাধানক্ষত্র শেষরাত্রি ঘ ৪।৪৯মিঃ। ধৃতিযোগ রাত্রি ঘ ৩।২৬ মিঃ। বণিজকরণ, দিবা ঘ ৭।৩৭ গতে বিষ্টিকরণ, রাত্রি ঘ ৮।২৭ গতে শকুনিকরণ। **জন্মে**—বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ঘ ৪।৪৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ৭।৩৫ মধ্যে ও ১২।৫২ গতে ২।১২ মধ্যে ও ৩।৩১ গতে ৪।৫১মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৩।৩১মধ্যে ও ৪।৩৬ গতে ৬।১৬ মধ্যে। **যাত্রা**—নাই। **শুভকর্ম্ম**-দীক্ষা। **বিবিধ**—চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ঘ ৭।৩৭ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও **পুণ্যতরা গঙ্গাস্নান**। দিবা ঘ ৭।৩৭ মধ্যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র ও পুণ্যতীর্থ **শ্রীপাট সপ্তগ্রামে** মহাপ্রভুর নাইলধন্ধনের কাটা হইতে উদ্ভূত ভগবৎলীলার সার্থক সৃষ্টি "**মাধবীলতাবৃক্ষ**" শোভিত ও নূপুরকুন্ড সমইন্বত **দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট বাটীতে** মহোৎসব। দিবা ঘ ১১।৪৫ হতে **মৃগনেত্রা নিবৃত্তি**। **ষড়শীতি সংক্রান্তি** ঃ সংক্রান্তিকৃত্য, **স্নানদানাদি ও অনধ্যায়। প্রদোষে** সন্ধ্যা ঘ ৪।৫১ গতে রাত্রি ঘ ৬।২৭ মধ্যে **শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত**। রাত্রিদত্তে সায়ংসন্ধ্যা কর্ত্তব্য। **গোস্বামিমতে সৌরমাস ব্রতপক্ষে শ্রীশ্রীকাত্যায়নী ব্রত সমাপন। কুমারীদিগের সৌজুতি পূজা সমাপন। শ্রীশ্রীত্রি বা ইতু পূজা সমাপন ও বিসর্জ্জন। অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ৯।৫২ মধ্যে ও ১২।২ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৩।৩১ গতে ৪।৫১ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ১২।৫৯ গতে ২।৪৬ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**— রাত্রি ঘ ২।৪৬ গতে ৩।৪০ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৯ অগ্রহায়ণ, ভাং ২৫ অগ্রহায়ণ,১৬ ডিসেম্বর, ২৯ অঘোন, ২৬ রবিঃ আউঃ। উঃ ঘ ৬।১৫, অঃ ঘ ৪।৫১ শনিবার, ত্রয়োদশী দিঃ ঘঃ ৭।৩৭।

২৬ রবিঃ আঃ উরস বু-আলী শাহ কলন্দর পানিপথ, ৩৬ বৎসর এবাদত করেছেন পানির মধ্যে তারপর ফকিরী লাভ করেন, আজ তাঁর ফয়েজ ও রুহানিয়াতে সকলে আনন্দ উপভোগ করছেন।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

পণ্য ও পরিষেবা কর ঃ পট পরিবর্তনের চাবিকাঠি

দেবরাজা রেড্ডি
পর্ব ১

পণ্য ও পরিষেবা কর বা জি এস টি এক ঐতিহাসিক কর সংস্কার। চালু হয়েছে ২০১৭-র পয়লা জুলাই। সম্পূর্ণ পালটে গেছে অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাপনা। এতে মিশে গেছে রাজ্য ও কেন্দ্রের সব অপ্রত্যক্ষ কর। স্বাধীনতার পরে সবচেয়ে ব্যাপক এই কর সংস্কারের লক্ষ্য 'এক দেশ-এক কর-অভিন্ন বাজার'-এর দিকে এগোনো। এতে শিল্প-বাণিজ্য মহল, সরকার, উপভোক্তা সকলেরই লাভবান হওয়ার কথা। আশা করা যেতেই পারে, জিএসটি পণ্য ও পরিষেবার দাম কমাবে। বিশ্বের আঙ্গিনায় ভারতের পণ্য ও পরিষেবা প্রতিযোগিতার বাজারে আরও ভালো জায়গায় পৌঁছবে। 'ভারতের তৈরি' কর্মসূচীর পালে হাওয়া লাগবে এর ফলে। আগের জমানায় কেন্দ্রের ও রাজ্যের অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোনও সংযোগ না থাকায় বহু ক্ষেত্রেই একই পণ্য বা পরিষেবার ওপর বারবার কর বসত। তা আর ফেরত হত না। জিএসটি-র আমলে এই সব বিভেদ মুছে গিয়ে নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবার ক্ষেত্রে একটি মাত্র করেরহার লাগু হয়েছে দেশজুড়ে। এই কর ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ অনেকটাই প্রযুক্তিনির্ভর। করদাতা এবং গ্রাহীতাকে কর্তৃ পক্ষের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ এখানে কম হলেও চলে। জিএসটি দেশকে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে বিশ্বের লগ্নিকারীদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে—এই আশা করাই যায়।

একটি উদাহরণ ঃ ধরা যাক, কারখানার গেট থেকে বেরোবার আগে একটি পণ্যের দাম ১০০ টাকা। ১২ শতাংশ উৎপাদন শুল্ক বসার পর তার দাম দাঁড়াচ্ছে ১১২ টাকা। এর ওপর ১২.৫ শতাংশ হারে মূল্যযুক্ত কর বা ভ্যাট বসলে ক্রেতাকে তা কিনতে হবে ১২৬ টাকায়। জিএসটি জমানায় কারখানার দাম ১০০ টাকার ওপর বসবে কেন্দ্রের জিএসটি বাবদ ৯ শতাংশ, আর রাজ্যের জিএসটি বাবদ ৯ শতাংশ কর। ফলে ক্রেতার কাছে তার দাম পড়বে ১১৮ টাকা। কাজেই বিশ্বের প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্যটি এখন আরও ভালোভাবে এগোতে পারবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, জিএসটি হল একটি সার্বিক কর ব্যবস্থাপনা। তা বসে উৎপাদন সরবরাহ ক্রমের প্রতি ধাপে। আগের ধাপের প্রদত্ত করের সাপেক্ষে পরবর্তী ধাপের করে ছাড় মেলে। জিএসটি আসলে পণ্য বা পরিষেবার ভোগের ওপর প্রযোজ্য একটি কর।

এক কথায় বলতে গেলে, জিএসটি লাগু হয় পণ্য ও পরিষেবার ওপর তার সরবরাহ ক্রমের একেবারে শেষ বিন্দুতে। কেননও একটি নির্দিষ্ট ধাপের উৎপাদক বা সরবরাহকারী উৎপাদন বা সরবরাহ ক্রমের আগের ধাপের প্রদত্ত করের সাপেক্ষে (Input Tax Credit) তার দেয় করে ছাড় পান। কারণ, আগের ধাপে প্রদত্ত করের টাকা তিনি আসলে তার ক্রয়ের সময় দিয়ে দিয়েছেন।

জিএসটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল এরকম ঃ

ক) জিএসটি মূল্যযুক্ত করের ধারণার ওপর আধারিত। এখানে স্বেচ্ছায় কর মেটানোর বিষয়টিতে জোর দেওয়া হয়।

খ) এটি একটি সার্বিক কর। সারা দেশে নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবায় কর অভিন্ন। এখানে Tax Credit বা উৎপাদন কিংবা সরবরাহ ক্রমের কোনও নির্দিষ্ট ধাপে কর প্রযুক্ত হওয়ার সময় আগের ধাপের কর বাবদ প্রদত্ত টাকার সাপেক্ষে ছাড় মেলে।

গ) সাধারণভাবে এখানে করের ভিত্তির হার দু'এর বেশি নয়।

ঘ) উপকর বা সেস, পুনর্বিক্রয় কর, অতিরিক্ত কর, বিশেষ কর, লেনদেন কর—এ রকম হাজার ঝামেলা নেই।

ঙ) একই পণ্য বা পরিষেবা উপর্যুপরি বারবার কর বসার উপব্রব নেই।

চ) রপ্তানি এবং এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পণ্য চলাচলে কর নেই।

ছ) মূলধনী পণ্য এবং কাঁচামাল কেনার সময় কর এমনভাবে প্রযুক্ত হয় যাতে উৎপাদন ব্যয় কমে।

জ) সারা দেশে একটি নির্দিষ্ট কর প্রশাসনের মাধ্যমেই জিএসটি প্রযুক্ত হওয়ায় আইনকানুন, রীতিনীতি সব জায়গাতেই এক।

ঝ) এটি গন্তব্যভিত্তিক কর। উপভোক্তার ভোগের ওপরেই এই কর প্রযুক্ত হয়।

জিএসটির সুবিধা ঃ

জিএসটি দেশ জুড়ে অভিন্ন বাজার তৈরি করায় দেশের অর্থনীতি আরও মজবুত হবে। দীর্ঘমেয়াদে সরকার এবং উপভোক্তা উভয় পক্ষই এর ফলে লাভভান হতে চলেছে।

এর সুবিধাগুলি এই রকম ঃ

ক) উৎপাদন শুল্ক, বিক্রয় কর, মূল্যযুক্ত কর—সবই জিএসটির মধ্যে মিশে যাচ্ছে। হরেক রকম করের জটিল সমস্যা থেকে রেহাই মিলছে।

খ) Input Credit System থাকায় উপর্যুপরি করের সমস্যা থাকছে না। প্রতি ধাপে মূল্যযুক্ত অংশটুকুর ওপরেই কর বসছে।

গ) দেশজুড়ে তৈরি হচ্ছে অভিন্ন বাজার। ফলে আন্তঃরাজ্য পণ্য সরবরাহে কম ঝামেলা পোহাতে হবে এখন। ফলে গোটা প্রক্রিয়াতে গতি আসবে। তরান্বিত হবে নিরবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন।

ঘ) স্বেচ্ছায় কর প্রদান বাড়বে। কর প্রশাসনে আসবে স্বচ্ছতা। পুরো ব্যবস্থাপনা অনেক স্বচ্ছ হয়ে ওঠায় ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা কমবে।

ঙ) আগেকার জমানায় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর আরোপ করায় আইনগত জটিলতাও বেশি ছিল। সফটওয়ারের মতো কয়েকটি ক্ষেত্রে কর বসানোর অধিকার কেন্দ্র না রাজ্য কার, তা নিয়েও কিছুটা ধোঁয়াশা ছিল। ফলে বহু ক্ষেত্রেই সমস্যা তৈরি হত।

চ) প্রশাসনের সুবিধা হয়েছে। আগের জমানায় নানা কিসিমের কর এবং উপর্যুপরি কর লাগু হওয়ার সমস্যার জন্য গোটা বিষয়টিকে সামলাতে বেশ বেগ পেতে হত সরকারের। এখন প্রয়োজনীয় সব তথ্যও মিলবে খুব সহজে। এক কর ব্যবস্থা চালু হওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে আইনগত জটিলতা কমায় প্রশাসনিক ব্যয়ও কমবে বলে আশা করা যায়।

ক্রমশ

বিদ্যালয়ে কাজের সময় বৃদ্ধির আশু প্রয়োজন

আশিসবরণ সামন্ত

মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলিতে কাজের সময় নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানান প্রশ্ন ওঠে। যাঁরা শিক্ষাদান কাজে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজের সময় কী হওয়া প্রয়োজন তা নতুন করে নির্ধারণ করার সময় এসেছে। এমন একটা সময় ছিল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট বহু কাজ করতেন। বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের বিদ্যালয়মুখী করার উদ্যোগ তাঁরা নিজেরাই নিয়েছিলেন। তাঁদের কাজের সময়ের কোনো নির্দিষ্ট সীমা পরিসীমা ছিল না। পঠন-পাঠন সময় ব্যাতিরেকে দিনের একটা বড়ো সময়ই তাঁরা শিক্ষার জন্য ব্যয় করতেন। বর্তমানে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতারও বহু পরিবর্তন এসেছে। মানুষ যন্ত্র ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও যন্ত্র হয়ে গিয়ে মেপে মেপে কাজ করতে চায়। শিক্ষক-শিক্ষিকারাই বা তার ব্যতিক্রম হবেন কেন? বড়ো আশ্চর্যের বিষয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মতো এত কম সময়সীমার কাজ সরকারি বেসরকারি কোনো বিভাগের কোনো কর্মী করার সুযোগ পান না। ২৮-০৭-১৯৬৭ তারিখের ১৯৩৪/ইডিএন/এস অনুযায়ী বর্তমানে বিদ্যালয়ের কাজের সময় মাত্র ৩০ মিনিট করে বেড়ে হয়েছে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা। এই সময় কিন্তু যথেষ্ট নয়। সমাজের প্রয়োজন বেড়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন সময় সূচিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদের বিশেষ করে গৃহ পরিবেশে শিক্ষার্থীর ও মায়েদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের নিয়মিত যোগাযোগ রাখারও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত কাজই তো বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। তারা কোনোরকমে এসে ক্লাস নেবেন আর ছুটির ঘন্টা বাজলেই চলে যাবেন এ কেমন কথা! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘন্টা বাজেই কেবল শিক্ষার্থীদের জন্য। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য নয়। বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের সময়সীমা থাকে ১১টা থেকে ৪.৩০মিনিট পর্যন্ত এই সাড়ে পাঁচ ঘন্টা হয় তাহলে প্রতিদিনের মূল জমায়েত হবে তারও ১৫মিনিট আগে অর্থাৎ ১০.৪৫মিনিটে। শিক্ষার্থীরা ১০.৪৫ মিনিট থেকে ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকবে। কিন্তু শিক্ষক-শিক্ষিকারা থাকবেন ১০টা থেকে ৫.৩০মিনিট পর্যন্ত। শিক্ষক-শিক্ষিকারা বলেন, অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ বা সার্বিক শিক্ষার জন্য আরও বেশি সময় দেওয়ার মতো সময় তাদের কোথায়? এই ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাজিরার সময় ১০টা হলে মূল জমায়েতের আগে ৪৫মিনিট এবং ছুটির সময় ৪.৩০মিনিট হলে শিক্ষার্থীদের ছুটির পরে আরও একঘন্টা সময় মোট ১ ঘন্টা ৪৫মিনিট সময় প্রতিদিন প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকা পাবেন। এই সময়সীমা বিদ্যালয়ের অভিভাবকরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে প্রয়োজন মেটাবেন। শিক্ষার্থীরাও তাদের প্রয়োজনমতো পরামর্শ নেবে। বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভা হবে। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল এবং স্টাফ কাউন্সিল সভা হবে। এছাড়াও অ্যাকাডেমিক বিষয়সংক্রান্ত অসংখ্য কাজ যা নাকি ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক-শিক্ষিকারা সময়ের অভাবে করতে পারেন না তাঁরা এই সময় করতে পারবেন। যে কাজটা পূর্বে অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সন্তোষজনক বেতনক্রম না পেশাগত নিরাপত্তা নিধারিত হওয়ার আগে স্বাভাবিক নিয়মে করতেন আজ সেই কাজটা সামাজিক প্রয়োজনে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়ে করাতে আইনের আশ্রয় নিতে বাধা কোথায়? শিক্ষক সমাজ ছাড়া আর কোন বিভাগের কর্মীরা প্রতিদিন মাত্র সাড়ে পাঁচ ঘন্টা কর্মক্ষেত্রে থাকার সুযোগ পান? এর মধ্যে আবার ৩০ মিনিট টিফিন এবং প্রতিদিন আরও দুটি থেকে চারটি বিরতি পিরিয়ড প্রত্যেকেরই থাকে যার সময়সীমা প্রায় দু-ঘন্টার কাছাকাছি।

সমাজে যখন বিশাল চাহিদা থাকছে তখন সামাজিক প্রয়োজনে এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই তৎপর হতে আর কালবিলম্বের কী আছে! শিক্ষা বিভাগেরই এ বিষয়ে নির্দেশনামা জারি করার ওপর অবিলম্বে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সামাজিক প্রয়োজনে এই মুহূর্তে এই উদ্যোগ গ্রহণের বিকল্প আর কিছু নেই। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় খোঁজার পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলছে। তারা প্রকৃত অর্থেই এখন বিদ্যালয়মুখী না হয়ে প্রাইভেট টিউশনমুখী। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও নিজেদের কাজের চাপ কমে যাওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন। কিন্তু সমাজ প্রকৃত অর্থে কী পাচ্ছে! শিক্ষাখাতের জন্য প্রদত্ত সরকারি টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় না হয়ে কিছু মানুষের প্রতিপালনের জন্য বা রুজি রোজগারের জন্য ব্যয় হচ্ছে। এই বিষয়ে তো ভাবনাচিন্তার দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

এখন সময় এসেছে দ্রুত পরিস্থিতি বদলানোর জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। শিক্ষাকে বিদ্যালয় নির্ভর করতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা মুখ্য এবং তাঁদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

তাই, কাজের সময়ের পরিবর্তন বর্তমানে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। অভিভাবকরা যদি হাতের কাছে নির্ভরযোগ্য পরিষেবা পান তাহলে তাঁরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে অন্যত্র ছুটবেন কেন? তাই সময় বৃদ্ধির মাধ্যমে এখনই পরিষেবা দেওয়ার পথ করে নিতে হবে।

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

সম্পাদক সমীপেষু

চৌদ্দশাক ভক্ষণের সংস্কার ও উপকারিতা

চৌদ্দশাক খেলে নাকি কার্তিকের টান থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কারণ, এই মাসে নাকি যমের বাড়ির আটটি দরজাই খোলা থাকে। এই প্রবাদটি গ্রামের মানুষের মুখে ছড়িয়ে রয়েছে। এটা একটা শাস্ত্রীয় কথা, তবে এর পিছনে বিজ্ঞানও আছে। প্রত্যেক ঋতুতে নানান রোগ হয়। বিশেষ করে সর্দিকাশি। প্রাচীনকালে ঋতুজব্যাধিপ্রতিরোধক কালোপযোগী ব্যবস্থা ছিল। সব প্রদেশেরই ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে নানা রোগ আসে ও হয়। বাংলার কোনও কোনও ঋতুতে রোগের প্রকট খুব বেশি। সেইজন্য আশ্বিন ও কার্তিক মাসকে যমদন্ড্রা মাস বলা হয়। এই সময় চৌদ্দটি শাক কার্তিক মাসের ভূতচতুর্দশীর (কালীপূজা বা দীপান্বিতা অমাবস্যার আগের দিন নাকি ভূতের উপদ্রব বেশি হয়, সেই জন্য এই দিনটিকে ভূতচতুর্দশী বলে) দিনে যাঁরা খান তাঁরা যমের আলয় থেকে অনেক দূরে থাকেন, এমন একটা ধারণা আছে। চৌদ্দশাকের স্বভাব ও গুণগত বর্ণনায় শাকগুলির প্রচলিত নাম (১) ওল (২) কেঁউ (৩) বেতো (৪) কালকসুন্দে (৫) সরিষা (৬) নিম (৭) জয়ন্তী (৮) শালিঞ্চা বা শাঞ্চে (৯) গুড়ুচী বা গুলঞ্চ পাতা (১০) পটল পাতা (১১) শেলুকা (১২) হিঞ্চে (১৩) ঘেঁটু বা ভাঁট (১৪) সুষুনি শাক। প্রতিটি শাক গুণসম্পন্ন ঔষধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চৌদ্দশাক খাওয়ার মধ্যে আরও একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। বর্ষাকালে শরীর ঠাণ্ডা থাকে, শরৎকালে প্রায়ই পিত্তের গণ্ডগোল হয়ে থাকে। সেইজন্য এই খাদ্যদ্রব্য এক সঙ্গে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। ছোটবেলায় দেখেছি মা, ঠাকুমা, পিসিমার মুখে মুখে ছিল চৌদ্দশাকের ফর্দ। পুরাতন ধারায় চলা মানুষেরা এইসব শাক জোগাড় করে চৌদ্দশাক খেতেন। ভূতচতুর্দশীর দিনটিতে তা খাওয়ার সূচনা হয়। ওই একটি দিন মাত্র খেলেই হত্তপালন হয় না। প্রতিদিন দু-তিনটি বা কয়েকটি মিলিয়ে খাওয়া উচিত। এ কোনও কুসংস্কার নয়, সাধারণ জ্ঞান।

—অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ
দেউলটি, হাওড়া-৩

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি কাদলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড (ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে), হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড (ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে), হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়